মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব

সত্যবতী গিরি

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমগ্র বাঙালি জাতিকেই যেন পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি রন্ধ্রে তাঁর মহাজীবনের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এখনো কাজ করে চলেছে। তাই কোন কোন সমালোচকের মতে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অনেকাংশে চৈতন্য-সংস্কৃতি বলা যায়। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ধর্মে সমাজচেতনায় কোন একজন মানুষের প্রভাব এতটা লোকায়ত হয়নি। বাংলার পদাবলী সাহিত্যেই শ্রীচৈতন্যের এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে পদাবলীর ধারা জয়দেব থেকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যযুগে বয়ে এসেছে। জয়দেবের মঙ্গল-সমুজ্জ্বলগীতির পর বিদ্যাপতি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র মন্থন করে রচনা করলেন রাধাকৃষ্ণলীলা-কথার বিচিত্র পর্যায়। পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এও রাধা-কৃষ্ণ লীলার কথা নতুন মাত্রা লাভ করল। এই সমস্ত শক্তিমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণের মধুররসাত্মক লীলাকেই শুধু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এঁদের পদাবলী ভক্তি রসিকের কাছেও বিশেষভাবে আবেদন জাগিয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে বলেছেন— 'জয়দেব বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি/কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দে/স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে/গায় শুনে পরম আনন্দে।' সুতরাং চৈতন্যদেব শুধু তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি, পূর্ববর্তী পদাবলীকারদেরও ভক্তিভাবুকতার বিশেষ মার্গে প্রতিষ্ঠিত করে অনেক বেশি প্রচারিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

অন্যদিকে তাঁর আবির্ভাবের পর পদাবলী সাহিত্যের প্রকরণ এবং ভাব— দু'দিক দিয়েই দেখা দিল অজস্র বৈচিত্র্য। এখন আর শুধু রাধাকৃষ্ণলীলা নয়, সন্ন্যাস-পূর্ব ও সন্ন্যাস-পরবর্তী চৈতন্য জীবন নিয়ে রচিত হ'ল অজস্র মর্মস্পর্শী গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ। এ ছাড়া মধুররসের সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য ও সখ্যরসের বহুপদ রচিত হ'ল, চৈতন্য পূর্বযুগে যা ছিল না। চৈতন্য পূর্বযুগের কবিগণ কোন বিশেষ ধর্মীয় দর্শনের দৃষ্টি থেকে তাঁদের পদাবলী রচনা করেননি। নর-নারীর প্রেমগাথা রচনার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভক্তিভাবুকতাই তাঁদের পদে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশে ও প্রভাবে রচিত গোস্বামীদের নবতর বৈষ্ণবদর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্র পরবর্তীকালের পদাবলী সাহিত্যের ধারাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করল। আগে যা ছিল শুধু পদাবলী, এখন তা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী। এছাড়া চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই নরোত্তম ঠাকুরের অনুষ্ঠিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খেতুরী উৎসবে কীর্তনগানের মুখবন্ধস্বরূপ গৌরচন্দ্রিকার পদকীর্তনও অপরিহার্য হয়ে উঠলো। এর মূলে যে তত্ত্ব কাজ করল, তা হচ্ছে, গৌরচন্দ্র রাধা এবং কৃষ্ণের মিলিত তনু। তাঁর নীলাচল-লীলায় বিরহ প্রলাপ ইত্যাদিতে তিনি একান্তভাবেই গোপীশ্রেষ্ঠা রাধা বলে প্রতীয়মান হলেন। দেহকান্তিতেও তিনি হ'লেন রাধারই দ্বিতীয় প্রতিমা। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মনে হয়েছিল এই ধরনের সুতীব্র ভাবোন্মাদ এবং সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ কেবল যুগধর্ম প্রচারের জন্য হতে পারে না। এই এক দেহে দুই লীলার সঙ্গতি নীলাচল-লীলায় সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী স্বরূপ দামোদরের চোখেই প্রথম ধরা পড়ে। তিনি নীলাচল-লীলায় মহাপ্রভুর বিচিত্র ভাববিকারকে পর্যালোচনা করে তার তাৎপর্য আবিষ্কার করে সূত্রাকারে শ্লোকে কড়চা করে রাখেন। ক্রমে চৈতন্যলীলার এই তাৎপর্য নীলাচল-বৃন্দাবনে সীমিত না থেকে বাংলাদেশের ভক্তদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। প্রতি বছর নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে রথযাত্রার

Scanned with CamScanner

সময় যে ভক্তবৃন্দ যেতেন, তাঁদেরই মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছিল। বাসুদেব ঘোষ এবং নরহরি সরকার প্রমুখ পদকর্তাগণ এ নিয়ে পদ রচনা করলেন :

যদি গৌর না হিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর-বৃন্দা- বিপিন-মাধুরি
প্রবেশ-চাতুরি সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

পদকর্তা গোবিন্দদাসও 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করে লিখেছেন 'জয় নিজকান্তা কান্তি-কলেবর/জয় জয় প্রেয়সী-ভাব বিনোদ।' পদকর্তা বলরাম দাসও কৃষ্ণের এই রাধাভাবরূপ গ্রহণের অপূর্ব বিষয়টি নিয়ে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলার আপাত বৈপরীত্যকে পাশাপাশি রেখে একটি চমৎকার পদ রচনা করেছেন। "শিখিপুচ্ছাঞ্চাবেড়া মনোহর যার চূড়া/সে মস্তক কেশশূন্য দেখি।/যাঁর বাঁকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে/এবে প্রেমে হলাইল আঁখি/সদা গোপী সঙ্গে রহে নানা রঙ্গে কথা কহে/এবে নারী নাম না শুনয়ে। ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজনারী/সেই ভুজে দণ্ড কেন লএ।।" বৃন্দাবনের গোস্বামীরাও খুব দ্রুতই কৃষ্ণের রাধাভাব গ্রহণের তত্ত্ব প্রকাশ করলেন এবং প্রকাশও করলেন। শ্রীরূপ রচিত "চৈতন্যাষ্টক"- এর এই ধরনের দুটি শ্লোক চৈতন্য চরিতামৃত-এ উদ্ধৃত হ'ল :

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়ে নোপনিষদাং
মুনীনাং সর্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশু পালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

শ্রীচৈতন্যদেব কি আবার আমাদের দৃষ্টিপথে আসবেন? তিনি তো দেবতাদের অভয় আশ্রয়, উপনিষদের পরমাগতি, মুনিদের সর্বস্ব, প্রণতজনের মধুরিমা ও গোপী প্রেমের নির্যাস। এই শ্লোকটিতে শ্রীরূপ গোস্বামী স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের মধ্যেই গোপী প্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অন্য একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন :

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

ভগবান শ্রীচৈতন্য আমাদের অপার কৃপা করেন। কৌতুকী তিনি। প্রণয়িনীদের অনির্বচনীয় অপরামধুর প্রেম সম্ভার হরণ করে উপভোগ করেছেন আপন শ্যামকান্তি তাদের স্বর্ণকান্তিতে আবৃত করে। এখানে শ্রীরূপ গোস্বামী শুধু গোপীভাব গ্রহণের কথাই বলেননি, শ্রীচৈতন্যদেব একই দেহে রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়ের ভাবকেই অঙ্গীকার করেছিলেন— একথাও বলেছিলেন। তবে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্বরূপ দামোদরের কড়চার একটি শ্লোকে—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকা
ত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্॥

রাধা স্বরূপত কৃষ্ণপ্রেমই, তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন নয়। কিন্তু লীলার জন্যে তাঁরা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা চৈতন্যের মধ্যেই এক হয়েছেন

Scanned with CamScanner

চৈতন্যকে নমস্কার করি। রূপ গোস্বামীর তার কড়চায় আরও বলেছেন :

> শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
> স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
> সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
> তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

চন্দ্র যেমন সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রও তেমনি শচীর সন্তান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে চৈতন্যরূপে জন্ম নিয়েছেন তিনটি স্বাদ পূরণের জন্য। প্রথম স্বাদ, রাধা প্রেমের মহিমা কতখানি তা তিনি জানবেন। দ্বিতীয় স্বাদ, সেই প্রেমের আলোকপাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের চমৎকারিতা কতখানি তা তিনি জানবেন। তৃতীয় স্বাদ, সেই চমৎকারিতা অনুভব করে রাধার আনন্দ কতখানি তা তিনি জানবেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত এ এই বিষয়টিকে সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।/সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।/ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি।" শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর ললিত মাধব নাটকের অষ্টম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের মাধুরী দর্শনে অভিভূত ও নিজ মাধুর্যভোগে ইচ্ছুক করে তুলেছেন :

> অপরিকলিত পূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
> স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ
> অয়মহমপি হন্ত। প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
> সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

এই চমৎকারী অদৃষ্টপূর্ব কোন্ মাধুর্যসার গরীয়ান হয়ে আমার সামনে প্রকাশ পাচ্ছে? আমিও এঁকে দেখে লুব্ধ চিত্ত হয়ে সানন্দে শ্রীরাধার মতো এঁকে উপভোগ করার জন্যে কামনা করছি। *ললিতমাধব* নাটকের নায়ক এই শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিরূপ, নাটকের এই অংশ থেকে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। নীলাচল বৃন্দাবনে গৃহীত একই দেহে রাধাকৃষ্ণের ভাবসম্বলিত চৈতন্যলীলা সম্পর্কে নব উপলব্ধি অনতিবিলম্বে বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত ও গৃহীত হয়েছে। এর ফলে কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার সমন্বয় আবিষ্কৃত হল, ভক্তেরা বৈষ্ণবধর্মের নতুন ও পূর্ণাঙ্গ পথের সন্ধান পেলেন এবং এর ফলে পূর্ব প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলো। নতুন রসশাস্ত্র তৈরি হল। পদাবলী তার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গী ত্যাগ না করেও সূক্ষ্মতর রসবিবেচনার আদর্শ গ্রহণ করল। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বৃন্দাবনলীলাকে স্পষ্ট, যথাযথ এবং গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করে প্রতিষ্ঠিত করল। চৈতন্য পূর্বযুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত একটি রসপর্যায় অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনকে অনুসরণ করে রূপগোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* এবং *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে প্রেমানুভবের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণাত্মক এবং ভাবভক্তির মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক এক বিস্তৃত এবং বিচিত্র রসপর্যায় সৃষ্টি করলেন। রাগাত্মিকা এবং রাগানুগা, বৈধী এবং রাগানুগা ভক্তির বিভিন্ন মার্গ প্রদর্শিত হল। রায় রামানন্দের আলোচনার সাধ্য-সাধন প্রসঙ্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির আরোহক্রম স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর গোবিন্দদাসের সময় থেকে এই সমস্ত প্রকার ও প্রকরণকে বিশ্বস্তভাবে অঙ্গীকার করে পদাবলী সাহিত্য রচিত হতে থাকলো।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরী উৎসবে কীর্তনগানের মুখবন্ধ হিসেবে গৌরচন্দ্রিকার পদকীর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ এর আগে থেকেই রচিত হয়ে আসছিল, তার এই বিশিষ্ট ব্যবহার খেতুরীর মহোৎসবের পর থেকেই অপরিহার্য হয়ে উঠলো। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা নিয়ে যেসব পদ রচিত

Scanned with CamScanner

হয়েছে, তাতে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর পদও আছে। এগুলিকে আমরা একেবারেই অব্যবহিত প্রভাব বলতে পারি। এই পদগুলির আন্তরিকতা, অলঙ্কারহীন সহজ সৌন্দর্য আমাদের বিশেষভাবে স্পর্শ করে। এই সময়ে রচিত রাধাকৃষ্ণলীলার পদেও পূর্ববর্তী আলঙ্কারিক আনুগত্য এবং পরবর্তী রসশাস্ত্রের আনুগত্য—দুই-ই অনুপস্থিত। এগুলিতে শুধু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চৈতন্যদেবের বিপুল প্রভাবে জনমানসের অস্তিত্বগ্রাসী অভিনব আনন্দময় ভক্তিচেতনা। মুরারি গুপ্তের একটি পদ উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে—'সখিহে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও/জিয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে/তাহে তুমি কি আর বুঝাও।।' এই সময় পদাবলী সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ব্রজবুলির ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। ব্রজবুলির এই প্রসারেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব প্রবলভাবে কাজ করেছে। গৌড়বঙ্গ, মিথিলা, আসাম, উৎকল, দ্রাবিড়, মথুরা, বৃন্দাবন, রাজস্থান, দ্বারাবতীর বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রেমভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এক ভক্তিসূত্রে আবদ্ধ এই বৃহত্তর বাংলাভাষা কোন বিশেষ প্রদেশের ভাষা না হয়ে মিশ্র-কৃত্রিম সুললিত সাহিত্যিক ব্রজবুলি হয়ে উঠেছে। আর এই ব্রজবুলি ভাষায় অসামান্য সব পদ উপহার দিয়েছেন গোবিন্দদাস। তাঁর উত্তরসাধকগণ এসেছেন আরও বহুতর পদের অর্ঘ্য সাজিয়ে। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে নবদ্বীপে যেসব ভক্ত মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, পরমানন্দগুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, গোবিন্দ আচার্য, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, যদুনাথ কবিচন্দ্র, বসুরামানন্দ, নিত্যানন্দভক্ত, বলরাম দাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, সুন্দর দাস বা সুন্দরানন্দ প্রমুখ।

শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশোদ্ভূত মুরারি ধর্মমতে রাম উপাসক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এঁর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম্ চৈতন্যজীবনীর আদি ও আকরগ্রন্থ। এঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি আন্তরিক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। মুরারি গুপ্তের "গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া" শীর্ষক পদে রাধা ভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদটিতে একদিকে যেমন গৌরাঙ্গের ভাবময় জীবনের অপূর্ব আলেখ্য অত্যন্ত সংক্ষেপে ফুটে উঠেছে, তেমনি গৌরগদাধর উপাসনার সূত্রপাতও এখানে করা হয়েছে। চৈতন্য সমসাময়িক পদবিষয়ক পদের সুখ্যাত পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের পদেও সন্তান হারা জননী শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যাকুল আর্তি আর বেদনা অপূর্ব ব্যঞ্জনায় রূপায়িত।

চৈতন্যপরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যে বিশেষ সংযোজন 'সখ্য' ও 'বাৎসল্য' রসের পদ। এও পদাবলী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবেরই ফল। এই পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ষোড়শ শতাব্দীর বলরাম দাস। তাঁর সমস্ত পর্যায়ের পদেই বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধতা লক্ষ করা যায়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আর এক সুদূর প্রসারী প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শনের সৃজন। তিনি নিজে 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া অন্য আর কিছু রচনা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁর উপযুক্ত ভক্তশিষ্য সনাতন, রূপ এবং জীবকে তিনি ভক্তিশাস্ত্র রচনায় প্রণোদিত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব আচরিত ধর্ম প্রধানত নাম জপ ও কীর্তন-নির্ভর। আনুষ্ঠানিকতাবিহীন বৈষ্ণবধর্মের ভাব প্রবাহকে সুদৃঢ় দার্শনিক ও রসভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। এ সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত-এ বলেছেন— "বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং/কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।/সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ/প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্"—অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন বিশ্বসৃষ্টির আগে বিধাতায় শক্তিসঞ্চার করেছিলেন শ্রীচৈতন্যও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বৃন্দাবনের হারিয়ে যাওয়া রাসলীলার কথা আবার জাগিয়ে তোলার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। আর সেই কারণেই চৈতন্যদেবের নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভগবৎ-তত্ত্বচিন্তা ও রসপরিকল্পনাকে বিধিবদ্ধভাবে পরিচালিত করার জন্য শ্রীরূপ ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করেন। এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। পঞ্চরস প্রকরণ যা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের নির্ভর তার বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

Scanned with CamScanner

শ্রীরূপের পরবর্তী গ্রন্থ *উজ্জ্বলনীলমণি*-কে আমরা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*-র উত্তর ভাগ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। গ্রন্থটি মধুর রসের সূক্ষ্মানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে পূর্ণ ; লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে যা রতি বা আদি রস বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাই মধুর ও উজ্জ্বল। এই গ্রন্থে মোট ১৫টি প্রকরণ আছে। এবং সমস্ত প্রকরণে রূপগোস্বামী উজ্জ্বল বা মধুররসের বিষয়ালম্বন, আশ্রয়ালম্বন, বিভাব, অনুভাব, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এই *উজ্জ্বলনীলমণি*-কে অনুসরণ করেই গোবিন্দদাস ও তাঁর পরবর্তী বিশিষ্ট বৈষ্ণব কবিরা পদ রচনা করেছেন। শুধু দর্শন বা রসশাস্ত্র নয়, শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত কাব্যনাটকও পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীরূপের দুটি বিশিষ্ট নাটক— *বিদগ্ধমাধব* ও *ললিতমাধব*। *ললিতমাধব*-নাটকটি রচিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যেরই নির্দেশে। এই নাটকের বিভিন্ন শ্লোক ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব কবির সৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর পদে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বিষয়েও সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন চৈতন্য-পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনাতে কবি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্যময় ভক্তিতদ্‌গত ও ভাবসমৃদ্ধ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ পদাবলী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শ্রীগৌরাঙ্গকে তিনি স্বচক্ষে দেখেননি। কিন্তু নিজের কবি হৃদয়ের কল্পনা ও ভক্ত হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যময় শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবতন্ময় দিব্যমূর্তি অঙ্কন করেছেন। তাঁর গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যরূপ, ভাবতন্ময়তা ও প্রেমধর্মের বৈশিষ্ট্য তিনটি একই সঙ্গে রূপায়িত। তাঁর পদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ণরূপ আমরা লাভ করি। চৈতন্যের ভাবোন্মত্ততার পূর্ণাঙ্গচিত্র ও অন্তর্লীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিক দিকের মেলবন্ধনে পদগুলি অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করল। এটি হ'ল জীবনী সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবন ভক্তকবিদের তাঁর জীবনী রচনায় প্রণোদিত করল। শুধু তাই নয়, এই একই প্রেরণার প্রবর্তনায় পরবর্তীকালেও বহু বৈষ্ণব জীবনী রচিত হল। এই জীবনীগুলি নানা বৈশিষ্ট্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য। এতে বাংলার নবদ্বীপপন্থী বৈষ্ণবভক্তদের চৈতন্যের অবতারত্ব সম্পর্কিত মত যেমন স্পষ্ট ভাবে জানা গেল, অন্যদিকে এই গ্রন্থ মধ্যযুগের এক বিশেষ সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটটিকেও ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততায় তুলে ধরল। সমকালীন নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যগর্বী ব্রাহ্মণদের অহঙ্কার, বৈষ্ণব-শাক্ত সম্প্রদায়ের বিরোধ, সুলতানি শাসনের নানা দিক, লোকায়ত বিভিন্ন ধর্মধারার ব্যাপক প্রসার, নবদ্বীপের সমৃদ্ধি এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনায় সমকালীন বাংলাদেশ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল বৃন্দাবনের লেখনীতে। লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* ও জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* আবার দুটি পৃথক দিক থেকে চৈতন্য জীবনকে প্রতিফলিত করল। নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাস তাঁরই প্রভাবে গৌরনাগরী ভাবের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার বিলাপ বর্ণনায় করুণ রসের উদ্রেকে আশাতীত সাফল্য। জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* চৈতন্যদেবের জীবন সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছে। তাঁর মতে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন উড়িষ্যাবাসী। তিনি চৈতনদেবের মৃত্যুর স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়েছেন। পুরীতে রথযাত্রার সময় পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বৈষ্ণবরীতির চেয়ে মঙ্গলকাব্য ও পৌরাণিক রীতি প্রকরণই তাঁর কাব্যে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা আর একটি চৈতন্যজীবনীকাব্য। এতে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন নয়, শেষ বার বছরের দিব্যোন্মাদ বর্ণনায় কবি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার গোস্বামী প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাও তাঁর এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। পদ্যে রচিত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এটি আসলে দর্শন গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কাব্যটি রচনা করেছেন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে। অজস্র বৈষ্ণবশাস্ত্রমন্থন করে এতে তিনি

Scanned with CamScanner

যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বৈষ্ণবের রসসাধনা রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব, সখীতত্ত্ব চৈতন্য অবতারের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী রচিত রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব সাধারণ বাঙালি পাঠকের দুরধিগম্য ছিল। কৃষ্ণদাসের এই চৈতন্যজীবনী স্বল্পশিক্ষিত বৈষ্ণবদেরও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল রহস্য উপলব্ধি করায় সাহায্য করেছিল। এছাড়া দুটি অপ্রধান চৈতন্য জীবনী *গোবিন্দদাসের কড়চা* ও চূড়ামণি দাসের *গৌরাঙ্গবিজয়*-এর নামও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই চৈতন্যজীবনীর প্রেরণায় বহু বৈষ্ণব আচার্যের জীবনী রচিত হয়েছে। সেই গ্রন্থগুলিও বাংলার সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানের মূল্যবান দলিল। এইগুলির মধ্যে *সীতা চরিত্র, সীতা গুণকদম্ব, অদ্বৈত প্রকাশ, অভিরাম লীলামৃত, নরোত্তম বিলাস, রসিকমঙ্গল* প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবই এই ভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি পৃথক জীবনমুখী সাহিত্য শাখার সৃষ্টি করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বর্ণাশ্রম-বিভাজিত হিন্দু সমাজের মনুষ্যত্বের অবমাননাকে অন্তত কিছুটা প্রতিরোধ করায় সক্ষম হয়েছিল। সেই সঙ্গে শুধু হিন্দু নয়, ইসলাম ধর্মাবলম্বী বেশ কিছু কবি শুধু যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা নিয়ে পদ রচনা করেছেন তা নয়, শ্রীচৈতন্যের প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য প্রভাবিত 'রাগানুগা' বৈষ্ণবভক্তিবাদ এঁদেরকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের বহুপদে একেবারে প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীচৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে। যেমন আকবর লিখেছেন :

জীউ জীউ মেরে মন চোরা গোরা
আপহি নাচে আপনা রসে ভোরা॥

লাল মামুদের পদে আছে :

সোনার মানুষ নদে এল রে
ভক্ত-সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে।

এই পদগুলিতে বিশুদ্ধ চৈতন্যভক্তি প্রকাশিত। বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির সংখ্যা একশর কাছাকাছি হবে। তার মধ্যে সৈয়দ মর্তুজা, নসির মামুদ ও আলিরাজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের প্রভাবই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক উদার অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

শুধু বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য অথবা জীবনী সাহিত্য নয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছিল মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা বৈষ্ণবীয় ভক্তি ধর্মের প্রভাবে তাদের উগ্র পূজা লোলুপতা পরিহার করে স্নিগ্ধ কোমল মমতাময় হয়ে উঠেছে কখনো কখনো। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠকবি মুকুন্দ তাঁর কাব্যের প্রথমে 'গণপতি বন্দনা'-র পর যে বিস্তৃত 'চৈতন্যবন্দনা' করেছেন তাতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মের স্বরূপও পরিস্ফুট হয়েছে—

হৈয়া অকিঞ্চন বশ দিয়া জীবে প্রেমরস
নিস্তার করিলা সর্বজন
.....
মহাকলি অন্ধকারে চৈতন্য অবতারে
প্রকাশিলা হরিনাম দীপ॥

চৈতন্যলীলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উল্লেখও মুকুন্দের চৈতন্যবন্দনায় পাওয়া যায়। সার্বভৌম কেশবভারতী, গদাধর পুরন্দর, মুকুন্দ মুরারি, বনমালী প্রমুখ চৈতন্য পরিকরদের উল্লেখ সমকালীন বাঙালি সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাপক ভক্তিধর্মের প্রভাবকেই প্রকাশ করে। মুকুন্দের

Scanned with CamScanner

কাব্যের অন্যান্য নানাস্থানে নানা ভাবে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ শ্রীচৈতন্যেরই পরোক্ষ প্রভাব—এটি নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'বণিক খণ্ড'-এ ধনপতি নগরিয়া শিশুদের নিয়ে পায়রা ওড়াতে বেরিয়েছে। এই শিশুদের সবার নামই কৃষ্ণের নামের প্রতিশব্দ। তথ্যের যথার্থ প্রতিপাদনের জন্যে নামগুলির তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই নামের মধ্যে আছে মুকুন্দ, মাধব, বনমালী, নারায়ণ, রামকৃষ্ণ জগন্নাথ, ভরত, লক্ষ্মণ, কংসারী, গোপাল, হরি, শ্রীধর হলধর জনার্দন, দামোদর, গদাধর, সুবল, সুদাম, হরিহর, পীতাম্বর, শিবরাম, মথুরেশ, হৃষিকেশ, শ্রীপতি, শ্রীনিবাস, পুরুষোত্তম, শ্যাম, কৃষ্ণদাস, অনন্ত, অচ্যুত, অক্রুর, ভৃগুরাম, চতুর্ভুজ, চক্রপাণি বলরাম, মুরারি, দৈত্যারি, গোবিন্দ, ভবানন্দ। এই নামের তালিকা বুঝিয়ে দেয় মুকুন্দরাম বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতায় বিশেষ ভাবে প্রাণিত ছিলেন। তাঁর কাব্যে অন্যান্য প্রসঙ্গেও কৃষ্ণলীলার বর্ণনা ও ভাগবত পাঠের জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ চৈতন্য প্রভাবেরই ফল। বালক শ্রীমন্তের শিশুক্রীড়া সমস্তই কৃষ্ণলীলা মূলক—

তিন বৎসরের জবে বাণিঞার বালা
শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা।

এছাড়াও প্রবাসী স্বামীর গৃহে ফিরে আসার কামনা করে লহনা প্রতিদিন ভাগবত পাঠ শোনে। শ্রীমন্ত পুতনা বধ, তৃণাবর্তবধ, বকাসুর বধ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার অভিনয় করে খেলা করে। আবার অন্যদিকে দেখি সিংহল-রাজকন্যা সুশীলা স্বামীকে দেশে ফিরে যেতে না দেওয়ার জন্য সুখী জীবনের যে ছবি তার সামনে তুলে ধরে তার অন্যতম উপাদান হল ফাল্গুন মাসে 'আনন্দে শুনিবে নাথ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র'।

শুধু মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ নয় পরবর্তী কবি ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যেও শ্রীচৈতন্যদেবের এবং ভাগবতের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের আধারেই তিনি তাঁর লাউসেন চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন। চরিত্র চিত্রণে, ঘটনা বর্ণনায় ও দৃষ্টান্ত স্থাপনে শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুসরণ অনেক জায়গাতেই করা হয়েছে। শক্তি বর্ণনায় শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়েও ঘনরাম বলেছেন যে তাঁর কৃপাতেই রাম রাবণকে সবংশে ধ্বংস করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করেছেন, অনিরুদ্ধ উষাকে পেয়েছেন। শুধু তাই নয় :

গোলকবিহারী হরি স্বামী পাইল গোপনারী
পূজি তব চরণ রাতুল।

স্থাপন পালায় সৃষ্টি বর্ণনায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহকে মহান সমর্থন করেনি—কর্ণসেনের প্রতি ক্রোধান্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে :

দৈবকী হৈল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি।

লাউসেনের বাল্যকালও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলারই অনুরূপ। লাউসেনের সমগ্র চরিত্রেও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব আছে। ইন্দ্রজাল কোটাল লাউসেনকে চুরি করে নিয়ে গেলে হৃত পুত্রের শোকে ব্যাকুলা রঞ্জাবতীকে কোন এক প্রবীণা রমণী তুলনা করেছে :

দারিকা নগরে যেন কৃষ্ণের নন্দনে
শম্বর হরিল শিশু সুতিকা সদনে।

এছাড়াও শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুবের কাহিনী ও সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদের কাহিনী ঘনরামের কাব্যে প্রভাব ফেলেছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে সমগ্র অঘোর বাদল পালাটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ইন্দ্রের ক্রোধ, গোকুলের ঝড়বৃষ্টি ও গিরি গোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণের গোকুলকে রক্ষার চিত্রটি স্মরণ করিয়ে দেয়। লাউসেনের গৌড় যাত্রার সময় বিদায় মুহূর্তে শোকব্যাকুলা রঞ্জাবতীকে তুলনা করা হয়েছে জননী যশোদার সঙ্গে। এইভাবে ঘনরাম ব্যাপকভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে চিত্র আর বর্ণনা গ্রহণ করে তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সর্বব্যাপ্ত এই বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ সমকালীন বিদগ্ধ মানসে চৈতন্য প্রভাবেরই বিশেষ ফল।

Scanned with CamScanner

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন মধ্যযুগের সামাজিক পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মূল্যবোধের সেই নবতর উদ্ভাস যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল সমাজ জীবনে আর সর্বতোভাবে সাংস্কৃতিক পরিণ্ডমলে। পরবর্তীকালে সেই প্রভাব হ্রাস হলেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নানাভাবে এর প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের যুগে এবং তার পরবর্তী আধুনিক সাহিত্যেও বিশেষভাবে এই প্রভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেই আলোচনার জন্যে পৃথক পরিসরের প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner